# একটি অসমাপ্ত আত্মজীবনী

**ড. শামস্ রহমান**

‘একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত
তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস
ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালবাসা আমার রাজনীতি
এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে’।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

যুগ যুগ ধরে উপমহাদেশের রাজনীতিকরা লিখেছেন তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে। শুধু অবসরেই নয়; লিখেছেন কারারুদ্ধ অবস্থায়ও। নেহেরুর লেখা Glimpses of World History এবং The Discovery of India দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন জেলে বসে মেয়ে ইন্দিরাকে লেখা চিঠির মাধ্যমে মানব ইতিহাসের এক চিত্র তুলে ধরেন Glimpses of World History’তে। আর ভারতের ইতিহাস, দর্শন ও কৃষ্টিসম্পর্কিত বিষয়াদি স্থান পায় Discovery of India’তে। জেলে বসে লিখেছেন আরও অনেক রাজনীতিক।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’* (The Unfinished Memoirs)। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য এবং সব থেকে মূল্যবান সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে পাকিস্তানি কারাগারে। ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে, যার শুরু ১৯৬৭’এর দ্বিতীয়ার্ধে।

গ্রন্থটি রচনার পটভূমি এরকম। বঙ্গবন্ধুকে সহকর্মীরা বলেন লিখতে - কারাগারে বসে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাবলী লিখতে। সাধারন পাঠকদের জন্য যে পূর্বে কখনো উল্লেক্ষযোগ্য তেমন কিছু লেখেনি** বা প্রকাশ করেননি; তিনি কিইবা লিখবেন? অকপটে স্বীকার করেন- ‘লিখতে যে পারি না; আর এমন কি করেছি যা লেখা যায়!’ (প. ১)। সহকর্মীদের অনুরোধ তাঁকে কতটুকু প্রভাবিত করেছিল তা বলা কঠিন। তবে সহধর্মিণী রেণুর*** অনুরোধে তিনি যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা স্পষ্ট - ‘বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী’ (প. ১)। শুধু বলেই খান্ত নন, ‘কালি-কলম-মন’, লেখার এই তিন উপকরণের যোগানও দিয়েছিলেন রেণু।

খন্ড খন্ড রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ঘটনা ও তার ধারাবাহিকতার মাঝে বঙ্গবন্ধু বাংলা, পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির এক বিশাল চিত্র তুলে ধরেন, যার ব্যাপ্তি ত্রিশ দশকের শেষার্থ থেকে পঁঞ্চান্ন সাল পর্যন্ত। প্রায় দুই দশকের এই সময়ে তিনি কখনো ছিলেন ছাত্র সংগঠক, কখনো উত্তীর্ণ হয়েছেন জাতীয় রাজনীতিক রূপে। সেই সময়ের রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা শুধু দূর থেকেই প্রত্যক্ষ করেননি, বঙ্গবন্ধু ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন এই সব বহু ঘটনার সীদ্ধান্তের সাথে। জড়িত ছিলেন কোলকাতার ভারত বিভাগের রাজনীতির সাথে। দেখেছেন প্রতিবাদ সত্ত্বেও জিন্নার রাজনীতির সূক্ষ মার প্যাঁচে ১৯৪০’র লাহোর প্রস্তাবের ‘আপাদতদৃষ্টিতে ছোট কিন্তু মৌলিক’ (‘স্টেটস’ থেকে ‘স্টেট’) রদবদল ঘটার ঘটনা। ওতোপ্রতভাবে জড়িত ছিলেন ভাষা আন্দোলন ও আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্মের সাথে। জড়িত ছিলেন যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি, নির্বাচন ও উত্থান-পতন।। কোন কঠিন বা ভাব-গম্ভীর তত্ত্বের মাঝে নয়, এই সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সহজ-সরল ভাষায়, অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং সততার সাথে। এটা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’র একটি মূখ্য দিক।

‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে একদিকে ফুটে উঠে বঙ্গবন্ধুর দেশ ও মানবপ্রেম; অন্যদিকে প্রকাশ পায় তাঁর সংগ্রামী চেতনা ও গণতান্ত্রিক মনোভাব এবং সেই সাথে রাজনৈতিক নেতার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্মীর প্রতি সহমর্মিতা। এই সব গুণাবলী বঙ্গবন্ধু কোন কাঠামোগত প্রথায় রপ্ত করেনি; তিনি এগুলো আত্তস্থ করেছেন অভিজ্ঞতার আলোকে। মাটি ও মানুষ থেকে শিখেছেন দেশপ্রেম; সামাজিক বৈষম্যতা করেছে তাকে সংগ্রামী; আর সহকর্মীদের ঘনিষ্ট সহচরে জন্মেছে সহমর্মিতা। একটি দৃষ্টান্তের কথাই ভাবুন। ১৯৫২ সনের জুলাই মাসে এক সহকর্মীর মাকে লেখা চিঠি। এই একটি মাত্র চিঠির মাঝেই ফুটে উঠে সহকর্মীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর মমত্ববোধের গভীরতা। যে মাকে সে কখনো দেখেনি; তার ছেলে আজ জেলে। তাকে আম্মা বলে সম্বোধন করে লিখেনঃ

> ‘‘আম্মা,
> আমার ভক্তিপূর্ণ ছালাম নিবেন। আপনি আমায় জানেন না - তবুও আজ লিখতে বাধ্য হচ্ছি।
> আপনার ছেলে খালেক নেওয়াজ আজ জেলখানায়। এতে দুঃখ করার কারণ নাই। আমিও

দীর্ঘ আড়াই বৎসর কারাগারে কাটাতে বাধ্য হয়েছি। দেশের ও জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করার জন্যই সে আজ জেলখানায়। দুঃখ না করে গৌরব করাই আপনার কর্তব্য। যদি কোন কিছুর দরকার হয়, তবে আমায় জানাতে ভুলবেন না। আমি আপনার ছেলের মত। খালেক নেওয়াজ ভাল আছে। জেলখানা থেকেই পরীক্ষা দিচ্ছে। সে মওলানা ভাসানী সাহেবের সাথে আছে।

আপনার স্নেহের'' (বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, পৃ. ৬১, দে, ২০১০)

চিঠির ভাষা ও ভাবে যা ফুটে উঠে তা শুধুই নান্দাইলের আচারগাঁও গ্রামের খালেক নেওয়াজের মাকে লেখা এ চিঠি নয় - এ যেন খালেক নেওয়াজের মায়ের অবস্থানে অবস্থিত বাংলাদেশের সমগ্র মা-জননীকে লেখা এ চিঠি। তাইতো এর আবেদন শাশ্বত। বঙ্গবন্ধু বুঝেছেন মায়ের বুকের চিরন্তন আকুতি; যার প্রকাশ ঘটেছে খালেক-রূপে আত্মপ্রকাশে ('আমি আপনার ছেলের মত') এবং তার সাথে একাত্মতা ঘোষনার মাঝে ('আমিও দীর্ঘ আড়াই বৎসর কারাগারে কাটাতে বাধ্য হয়েছি)। একদিকে মাকে দিয়েছেন সান্ত্বনা ('এতে দুঃখ করার কারণ নাই'), শুনিয়েছেন আশার বাণী ('জেলখানা থেকেই পরীক্ষা দিচ্ছে'), দিয়েছে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি (সে ভাসানী সাহেবের সাথে আছে)। অন্যদিকে, মায়ের কাছে সন্তানকে করেছেন গৌরবান্বিত (দেশের ও জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করার জন্যই সে আজ জেলখানায়। দুঃখ না করে গৌরব করুন)। বাংলার মা এর চেয়ে বেশী কিছু কি চায়?

রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। আত্মজীবনীতে এ বিষয়টির সাথে পাঠকরা মুখামুখি হবে বারবার। মওলানা ভাসানীর সাথে রাজনীতি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। যুক্তফ্রন্টের সময় একসাথে কাজ করেছেন শেরে বাংলা ফজলুল হকের সাথে। বঙ্গবন্ধু মওলানা ভাসানীকে দেখেছেন একজন নিঃস্বার্থ, ত্যাগী এবং সাহসী রাজনীতিক হিসেবে। অন্যদিকে, মওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধুকে দেখেছেন একজন কঠিন পরিশ্রমী ও দক্ষ সাধারণ সম্পাদক তথা রাজনীতিক হিসেবে। তাদের এই সম্পর্কের কারণে মওলানা ভাসানীর অনেক একক সিদ্ধান্তের প্রতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু আস্থা রেখেছেন তাঁর উপর। তবে রাজনৈতিক গুরু হিসেবে যাকে মানতেন সে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অগাত আস্থা ও বিশ্বাস। তিনি বঙ্গবন্ধুকে সত্যিকার অর্থেই ভালবাসতেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি সোহরাওয়ার্দীর স্নেহ ও ভালবাসার কথা বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন 'তিনি যে সত্যিই আমাকে ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন, তার প্রমান আমি পেয়েছি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার দিন পর্যন্ত' (পৃ. ২৯)। তবে এটাও সত্য, নীতির জন্য তিনি কারো সাথে কখনো আপোষ করেননি। একবার কোন এক বিষয়ে সোহরাওয়ার্দীর সাথে কথা কাটাকাটি হয়। হঠাৎ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুকে বলে বসে 'Who are you? You are nobody'। প্রতি উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন 'If I am nobody, then why have you invited me (to this meeting)? You have no right to insult me. I will prove that I am somebody'। এ্যরোগেন্ট শোনালেও, অশ্রদ্ধার কোন সূর ছিল না তাতে - বরঞ্চ 'Thank you Sir' (পৃ. ২৯) বলে সবিনয়ে বেরিয়ে আসেন।

সত্যিকার অর্থে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা, আর নীতির সাথে আপোষহীন মানষিকতা প্রকাশের, কোন দ্বন্দ্ব নেই। বরঞ্চ, একে অপরের সম্পূরক। ষাটের দশকে বাংলাদেশ একঝাক বুদ্ধিদিপ্ত, প্রগতিশীল ও সাহসী ছাত্র রাজনীতিকের জন্ম দেয়। সত্তুরে এসে তাঁরা জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করে। বয়সের ভারে তাঁরাও আজ ধীরে ধীরে সরে দাঁড়াচ্ছে রাজনীতি থেকে। সত্তুরের পর আরও চার দশক গেল। পেল কি বাংলাদেশ বুদ্ধিদিপ্ত ও সাহসী ছাত্র অথবা জাতীয় রাজনীতিক? বর্তমান ছাত্র রাজনৈতিক অঙ্গনে এই ধরনের গুণাবলী সমপন্ন রাজনীতিক পাওয়া ভার। তাহলে কি জাতি নেতৃত্ব শূন্যতায় ভোগবে অদূর ভবিষ্যতে? বাংলাদেশ তথা উন্নয়নশীল দেশগুলি অবকাঠামোগত সমস্যায় জর্জরিত। আইন-কানুন থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ প্রয়োগ থেকে অনেকটাই বঞ্চিত। তাইতো বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সুশাসন কায়েমে তরুণ বুদ্ধিদিপ্ত ও সাহসী রাজনীতিকের এত বেশী প্রয়োজন। তাইতো, বঙ্গবন্ধু পাঠ এখনো প্রাসঙ্গিক।

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির দুটি প্রধান স্তম্ভ - ঐক্য আর গণতন্ত্র, আত্মজীবনীতে বর্ণিত তাৎপর্যপূর্ণ বহু রাজনৈতিক ঘটনাই এর সাক্ষর। তবে একটি বাদে অন্যটি নয়। ঐক্য হতে হবে গণতন্ত্রে ও সঠিক নেতৃত্বে। এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যুক্তফ্রন্টের ঐক্য আলোচনায়। আজ এদল, কাল সেদল। আজ এ নেতা, কাল অন্য নেতা - এই সব নেতা-কর্মী, এক কথায় এই প্রকৃতির রাজনীতিকদের নিয়ে আর যাই হোক, দেশ ও দশের সেবা করা যে সম্ভব নয়, তা বঙ্গবন্ধু তার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম প্রহরেই বুঝেছিলেন। একাধিকবার বলেছেন - 'নীতিহীন নেতা ও রাজনীতিবিদদের সাথে কোনদিন একসাথে হয়ে দেশের কোন কাজে নামতে নেই' (পৃ. ২৭৩)। আদর্শহীন লোক নিয়ে ক্ষমতায় গেলেও দেশের কাজ হবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার হতে পারে' (পৃ. ২৪৯)। শুধু কথায় নয়, প্রমান করেছেন কাজে-কর্মেও। ১৯৭১'র মার্চে বলতে পারা 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না', বঙ্গবন্ধুর বিচ্ছিন্ন কোন উচ্চারণ নয়। এর দেড় যুগ আগের কথা। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়ের পর মওলানা

ভাসানী বলেন - 'দরকার হলে তোমাকে (বঙ্গবন্ধুকে) মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে হবে' (পৃ. ২৬২)। যখন সোহরাওয়ার্দী জিজ্ঞেস করেন - 'তুমি মন্ত্রিত্ব নেবা কিনা' (পৃ. ২৫৯), উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন - 'আমি মন্ত্রিত্ব চাই না। পার্টির অনেক কাজ আছে, বহু প্রার্থী আছে দেখে শুনে তাদের করে দেন' (পৃ. ২৫৯)। ফজলুল হক বলেন - 'তোকে মন্ত্রী হতে হবে। আমি তোকে চাই, তুই রাগ করে 'না' বলিস না' (পৃ. ২৬২)। শেষে অবশ্য বঙ্গবন্ধু রাজি হন এবং মন্ত্রীও হন। তবে এটাও সত্য, মন্ত্রিত্ব বন্টনে যখন ষড়যন্ত্রের আভাস পান, তখন ফজলুল হককেও বলতে দ্বিধা বোধ করেননি - 'এ সমস্ত ভাল লাগে না, দরকার হয় মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব' (পৃ. ২৬৭)।

আজগের চিত্র ভিন্ন। আজ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মন্ত্রী হবার জন্যই যেন রাজনীতি। দেশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার প্রেষণা, প্রায়ওরিতি তালিকায় সর্ব নিম্নে। আর একবার মন্ত্রী হলে তা যেন কামনা-বাসনায় চিরস্থায়ী বন্দবস্ত। বাংলাদেশে অনেক রাজনীতিকই আছেন যারা প্রায় সব সরকারেরই মন্ত্রী ছিলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারই তাদের নীতি ও আদর্শ। ছলে বলে কলা কৌশলে মন্ত্রী হওয়া এবং তা যে করেই হোক ধরে রাখার মাঝে সৃষ্ট রাজনৈতিক ভিশ্যাস চক্রের মাঝে ক্ষত হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা; আর হয় ব্যাহত অর্থনীতি। মন্ত্রিত্ব পরিচালনায় ব্যর্থ হলে, তা হোক অযোগ্যতা, অদূরদর্শীতা বা পরিস্থিতি জনিত, কিংবা জনগণের নীরব অসমর্থন (perceived) জনিত; মন্ত্রিত্ব থেকে সড়ে দাঁড়ানোর ফলে সৃষ্ট হয় এক ধরনের ভারচুয়াস (উৎকর্ষ) চক্র, যা ধাপে ধাপে রাজনৈতিক কাঠামোকে সংহত করে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক।

১৯৪৭ শে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ হলেও, ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেন - বাঙালি ধর্মে গভীর বিশ্বাসী, তবে ধর্মের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। এই উপলব্ধি থেকেই জন্ম নেয় বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতি; স্বাধীনতার পর যা অন্তর্ভূক্ত হয় বাংলাদেশের সংবিধানের চার স্তম্ভের এক স্তম্ভে। যুক্তফ্রন্টে বঙ্গবন্ধু নির্বাচন করেন গোপালগঞ্জ-কোটালীপাড়া আসনে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মুসলিম লীগ প্রার্থী। ধনবান এই প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে অবলম্বন করেন ধর্মকে। এলাকার মওলানাদের সংবদ্ধ করে ফতোয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ('আমাকে <বঙ্গবন্ধুকে> ভোট দিলে ইসলাম থাকবে না, ধর্ম শেষ হয়ে যাবে' <পৃ. ২৫৬>)। সেই সাথে আরও স্লোগান - (আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে) 'পাকিস্তান ধবংস হয়ে যাবে, ... মুসলিম লীগ পাকিস্তানের মাতা। ... (আওয়ামী লীগ) হিন্দুদের দালাল, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা এক করতে চায়' (পৃ. ২৫৮)। তারপরও শেষ রক্ষা হয়নি তাদের। বঙ্গবন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধুর ধারনা জন্মে - 'জনগণকে ইসলাম ও মুসলমানের নামে স্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায় না। ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানরা তাদের ধর্মকে ভালবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধি করতে তারা দেবে না....' (পৃ. ২৫৮)।

ধর্মকে মূলধন করে যারা রাজনীতি করে তাদের দেয়া এ স্লোগান গুলো আমাদের অতি পরিচিত। ১৯৭০'র নির্বাচনেও শুনেছি এ ধরনের স্লোগান। তথাপি, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মত ১৯৭০'র নির্বাচনেও দেখেছি মুসলিম লীগ-জামাতের ভরাডুবি। ১৯৭১'এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারা ইসলামের নামে একই স্লোগান তুলে আর কাজ করে মানবতার বিরুদ্ধে ('আমাদের দেহ ও প্রাণ শুধু এবং শুধুই ইসলামের জন্য। আমরা ইসলামের জন্যই এসব কাজ করেছি <হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি>। .... আমরা পাকিস্তানকে উপাস্য মনে করে নয়, মসজিদ মনে করে আমাদের ঝুঁকি ও আমাদের ভবিষ্যতকে এর উপর ন্যস্ত করেছিলাম' - ডিসেম্বরে বিজয়ের ঠিক পূর্ব মূহুর্তে পূর্ব পাকিস্তানের আল-বদর প্রধান আলী আহসান মোজাহিদের সমবেত আল-বদরদের উদ্যেশে প্রদত্ত ভাষনের অংশ <জনকণ্ঠ, ১৪ ডিসেম্বর, ২০১২>) । আজ ২০১২'তেও শুনি তাদের একই স্লোগানের ধবনি। তাদের কার্যকর্মের ধারাবাহিকতায় বার বার প্রমান করেছে এরা ধর্মের নামে ধবংস ও হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তারা ৭১'এর যুদ্ধাপরাধী। তাদের শাস্তি পেতেই হবে মানবতার বিরুদ্ধে অন্যায়ের জন্য। বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন এদের বিচার। অনেকের সাজাও হয়েছিল সে বিচারে****। যারা বলে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করেছেন, তারা মিথ্যা কথা বলে। সাধারণ ক্ষমা তাদেরকেই করেছিলেন, যাদের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ বা অগ্নি সংযোগের কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এগুলো কথার কথা নয়, এগুলো ডকিউমেন্টেড ফ্যক্ট (ফ্যক্টস এ্যান্ড ডকুমেন্টস্ বঙ্গবন্ধু হত্যা, পৃ. ৫০; জনকণ্ঠ, ১৪ ডিসেম্বর, ২০১২)।

১৯৭৫'এর পটপরিবর্তণের পর যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে তারা প্রতিবিল্পবী। তাই তারা স্বাধীনতার পরাজিত ঘৃণ্যশক্তি রাজাকার-আলবদর; জামাত-মুসলিম লীগারদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে; আর পূনঃবহাল করে ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি। যারা যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসিত করে, যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতির ব্যবসা করে; যারা আজ ২০১২ বিজয়ের মাসে ঢাকার পথে পথে হরতালের নামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জামাত-শিবিরের ধবংস ও হত্যার রাজনীতিকে সমর্থন জোগায়; যারা যুদ্ধাপরাধী বিচারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তারা একই সূত্যে গাঁথা। তাদের শহীদ মিনারে কিংবা বুদ্ধিজীবিদের সমাধিস্থলে যাওয়ার, অথবা বিজয়ের পতাকা তলে স্থান পাবার অধিকার আছে কি? শুধু অসংলগ্নভাবে জানা নয়; বাঙালি স্বাধিকার আন্দোলনের ঘটনা ধারাবাহিকতার

সাথে বোঝা ও উপলব্ধির জন্য স্বাধীনতা উত্তর প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু পাঠ অতন্ত প্রাসঙ্গিক।

১৯৭৩ থেকে ২০১২। প্রায় চল্লিশ বছর। ১৯৭৩ বহিঃবিশ্বের বহু সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী দেশের মতামতকে উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছিলেন। এতে নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধু সাহসীকতার প্রমাণ মেলে; তবে সেদিনের বিচারের দন্ড দীর্ঘস্থায়ী হয়নি প্রতিবিল্পবীদের থেকে অসতর্কতার কারণে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর আবার শুরু হয়েছে যুদ্ধাপরাধী বিচার। এ বিচারকার্যের মাঝে বাংলাদেশের আজকের সরকার প্রমান করেছে বঙ্গবন্ধুর সরকারের মত তারাও সাহসী এবং গণমানুষের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তবে এবারের বিচারের রায়কে স্থায়ীত্বশীল করার জন্য প্রতিবিল্পবীদের থেকে সতর্ক হতে হবে। ১৯৭১, ১৯৭৫ এবং ২০০৪ মত যে কোন সময় তারা আবার পারে আঘাত হানতে। হত্যা ও ধবংসে এরা সিদ্ধহস্ত। সেই সাথে সতর্ক থাকতে হবে বুদ্ধিজীবিদের যারা তাদের লেখনীর মাঝে উন্মোচন করছেন ঘাতক দালাল, জামাত-শিবির এবং তাদের দোসরদের প্রকৃত চেহারা।

'অসমাপ্ত আত্নজীবনী'তে খুঁজে পাওয়া যায় এক সাধারণ বাঙালিকে, যে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার, নির্যাতন সহ্য, আর ক্ষমতার মোহ উপেক্ষা করে উত্তির্ণ হয়েছেন এক মহান ব্যক্তিত্বে।

রাজনৈতিক জীবনের বাইরে রাজনীতিকদেরও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন থাকে। বঙ্গবন্ধুরও ছিল। তবে তা রাজনীতির কারণে উপেক্ষিত হয়েছে বার বার এবং তা এতটাই উপেক্ষিত হয় যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সন্তানের কাছে পিতা রয়ে যায় যে কোন পুরুষ রূপে ('কামাল কিছুতেই আমার কাছে আসল না। দূর থেকে চেয়ে থাকে। ও বোধহয় ভাবত, এ লোকটা কে?' (পৃ. ১৮৪))। যখন তাদের বিয়ে হয়, তখন বঙ্গবন্ধুর বয়স হয়তো তের। আর তার সহধর্মিণী রেণুর বয়স তিন। পুতুল-পুতুল বিয়ে, পরবর্তিতে ফুলশয্যা এবং সময়ে তাদের মাঝে গড়ে উঠে এক সুন্দর সম্পর্ক। রেণু একদিকে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রেরণার উৎস, অন্যদিকে পালন করেছেন সংসারের ষোল আনা দায়ীত্ব। রাজনৈতিক কারণে টুঙ্গিপাড়ার সংসার ছেড়ে কখনো তিনি কোলকাতায়, কখনো ঢাকায়, কখনো বা জেলে থাকা সত্ত্বেও, আত্নজীবনী'তে এটা স্পষ্ট, তাদের মাঝের পার্থিব দীর্ঘ দূরত্বের পথ হৃদয় পটে রয়ে গেছে নাতিদীর্ঘ পথে।

যারা Big Picture দেখে, তাদের জন্য খুঁটিনাটি দেখার সময় কোথায়? যারা দেশ দেখে, তাদের কাছে অনিচ্ছাকৃত উপেক্ষিত হয় সংসার। এ দোষে গান্ধীর মত বঙ্গবন্ধুও দোষী।

---

* শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২), *অসমাপ্ত আত্নজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, মতিঝিল, ঢাকা, বাংলাদেশ।

** তবে গবেষকদের মতে বঙ্গবন্ধু ছাত্র জীবন থেকে ডায়েরি লিখতেন যা এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭২ সনে ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেনঃ পাকিস্তানি ..... বর্বর বাহিনী আমার আসবাবপত্র .... দ্রব্য-সামগ্রী লুণ্ঠন করেছে তাতে আমার দুঃখ নেই। আমার দুঃখ, ওরা আমার জীবনের ইতিহাসকে লুণ্ঠন করেছে। আমার ৩৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনের দিনলিপি ছিল ... বর্বররা .... লুণ্ঠন করেছে' (আহমদ সালিম - *পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দি জীবন*, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১০৪)।

*** বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণীর আসল নাম বেগম ফজিলাতুননেছা এবং এ নামেই সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত। তবে বঙ্গবন্ধু আত্নজীবনীতে পাঠকদের কাছে তার সহধর্মিণীকে ডাক নাম 'রেণু' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন।

**** বন্দী ও দন্ডের কিছু পরিসংখ্যান যা ততকালীন সময় প্রকাশিত হয়ঃ স্বাধীনতার পর পর ১৯৭২ সনের দালাল আইনে রাজাকার-আলবদর ও পাকবাহিনীর সহযোগিদের বন্দী করা হয়। ১৯৭৩'এর ৩১ শে অক্টোবর পর্যন্ত দালাল আইনের অধীনে ৩৭ হাজার ৪৭১ জনকে বন্দী করা হয়। এবং একি সময়ে বিচার সম্পন্ন হয়েছিল ২ হাজার ৮৪৮ জনের। এদের মধ্যে দন্ডপ্রাপ্ত হয় ৭৫২ জন। অনেকের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয় প্রদত্ত প্রকাশিত, ১/১২/৭৩ - ফ্যাক্টস এ্যান্ড ডকুমেন্টস্ বঙ্গবন্ধু হত্যা, পৃ. ৫০)। যুদ্ধাপরাধী-বিচারের রায়ের আরও কিছু তথ্য - ৬ই জানুয়ারি ১৯৭৩, বুদ্ধিজীবি হত্যা মামলায় আসামি রাজাকার খলিলের যাবজ্জিবন কারাদন্ড; ২৯ শে জুন ১৯৭৩ সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেন মামলায় রাজাকার খলিলের যাবজ্জিবন কারাদন্ড; ৩১শে অগাষ্ট ১৯৭৩ কুখ্যাত রাজাকার মুন্নার মৃত্যুদন্ড (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩)।